স্বর্ণবাজ

সিদ্দিক আহমেদ

অরণ্যমন প্রকাশনী

ভূ মি কা

‘স্বর্ণবাজ’ সম্ভবত আমার সবচেয়ে দীর্ঘ সময় নিয়ে লেখা উপন্যাস। প্রায় এক যুগ আগে লেখা শুরু করেছিলাম বলে মনে পড়ছে। বারো ভূঁইয়াদের নেতা ঈসা খাঁ-র জীবনের আলোকে এই উপন্যাস লিখতে গিয়ে আমি প্রতি পদে পদে চমৎকৃত হয়েছি। প্রথমে ভেবেছিলাম সবমিলিয়ে একখানা বই হবে। কিন্তু এর কাঠামোগত বিস্তৃতি আমার সে-সিদ্ধান্তে যবনিকা টানতে বাধ্য করেছে। বলা বাহুল্য, ঈসা খানের জীবনের তিনটি প্রধান অংশের এটি প্রথম খণ্ড। অনুজপ্রতিম সুলেখক ও প্রকাশক জুটি মুবিন এবং নাবিদকে ধন্যবাদ তাড়া দিয়ে বইয়ের কাজ শেষ করিয়ে নেওয়ার জন্য।

মধ্যযুগ সবসময় আমাকে তাড়িত করে, ভাবিত করে। প্রযুক্তির ছোঁয়া সবে লেগেছে দুনিয়ার হালে। মানুষ আধুনিকতার দ্বারে, তবে বন্যতা তখনও ছেড়ে যায়নি তাদের। মানুষ সেসময় বিবেকের চেয়ে যেন আবেগ দিয়েই বেশি চালিত হয়েছে। আর সেই আবেগের কারণে বদলে গেছে এক একটি জনপদের ভাগ্য তথা ইতিহাস। কী অদ্ভুত বিচিত্র এক সময়! মানুষের জীবন যেন ঝুলে ছিল তলোয়ারের ডগায়; একটু ভুল, সাথে সাথে জীবনাবসান।

সেই অদ্ভুত সময়ের অনুভূতিগুলোই আমি ধরতে চেয়েছি। ধরতে চেয়েছি সেসময়ের সমাজ এবং প্রথা। যুদ্ধের রণকৌশল থেকে অন্দরমহলের আদিমতা— সবই ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছি একেবারে নিজের মতো করে। তবে সচেতনভাবে ইতিহাসকে অবিকৃত রাখার প্রয়াস ছিল। কল্পনার ঘোড়া যে ছোটাইনি তা বলতে পারব না। তবে সে ঘোড়া ইতিহাসের চৌহদ্দি পার হয়নি।

বহু আগে লেখা শুরু করেছিলাম বলে লেখায় কাঁচা হাতের ছাপ ছিল। আমি এবং আমার স্ত্রী সম্পাদনা-পর্যায়ে ঘষেমেজে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি সেই কাঁচা হাতের ছাপটুকু সরিয়ে ফেলতে। তবুও কিছুটা রয়ে গেল বোধহয়। থাকুক না! কিছু জিনিসে একটু পুরোনো ছাপ থাকাটা বোধহয় মন্দ নয়।

‘স্বর্ণবাজ’ লিখতে গিয়ে আমাকে অসংখ্য বইপত্র, সিনেমা, তথ্যচিত্র এবং ব্লগের সহায়তা নিতে হয়েছে। সেসব তোলা থাক শেষ বইয়ের জন্য। আপাতত পাঠককে স্বাগত জানিয়ে যাত্রা শুরু করি মধ্যযুগের ধুলোময় পথে।

প্রথম কিস্তি

বিদ্রোহী সুলতান

১

গ্রীষ্মের খরতপ্ত এক দুপুর। হঠাৎ হঠাৎ ঝড়ো বাতাস তার উপস্থিতি জানান দিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম আকাশে কিছু তুলোট সাদা মেঘ লাগামছাড়া হয়ে ধীরে ধীরে পাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রৌদ্রোজ্জ্বল সেই খোলা আকাশের নিচেই ইছামতী নদীর পাড় জুড়ে ফেলা হয়েছে উইয়ের ঢিবির মতন সারি সারি তাঁবু। নদীর পাড়ে হাজার হাজার ধূসর আর সাদা রঙের তাঁবুগুলো মাকড়সার জালের মতন ছড়িয়ে আছে। সেই জালের ঠিক কেন্দ্রে টকটকে লাল বিশাল তাঁবুটা আলাদাভাবে চোখে পড়ে। সেটা বঙ্গের বিদ্রোহী সুলতান সোলায়মান খানের শাহি নিয়ন্ত্রক তাঁবু। এখানে বসেই তিনি তাঁর যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যুদ্ধ থেকে সাধারণ বিচার, সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করা হয় এখান থেকে। তাঁবুটাও দেখবার মতন। আয়তনে সেনাছাউনির সবচেয়ে বড়োটারও চারগুণ। উচ্চতায় অন্যগুলোকে বহু আগেই হার মানিয়েছে। এর লাল লম্বা বর্শার ফলার মতন মাথাটা যেন মন্দিরের চুড়োর মতন আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। সুউচ্চ চুড়োটাই যেন প্রকাশ করছে তাঁবুটার সর্বৈব ক্ষমতার মহিমা। এর সামনের বড়ো খোলা অংশটাকে কাঠের মজবুত বেড়া দিয়ে ঘিরে নিরাপত্তা বলয়ের মতন তৈরি করা হয়েছে। বলয়ের চারপাশে নিরাপত্তার জন্য মজুত রয়েছে বেশ কিছু সৈন্য। তারাও দায়িত্ব পালনে সদা সতর্ক।

আজ শাহি তাঁবুটার চারপাশে অন্যদিনের চাইতে চাঞ্চল্য তুলনামূলক বেশি। তাজ খানের দূত এসেছে, এ খবর সৈন্যশিবিরে চাউর হতে সময় লাগেনি। বাতাসের চেয়ে দ্রুতগতিতে খবর ছুটেছে কান থেকে কানে। ফলে লাল নিয়ন্ত্রক তাঁবুর নিরাপত্তা বলয়ের চারপাশে পা ফেলার জায়গা নেই। অসংখ্য সৈনিক উঁকিঝুঁকি মেরে ঘটনা অনুধাবনের চেষ্টা করছে। তীব্র দাবদাহের কারণে সবাই ঘর্মাক্ত এবং ক্লান্ত, তাতে অবশ্য কারওরই উৎসাহে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। ফিশফিশানির গুঞ্জনে ভরে উঠেছে

বাতাস। কানাকানি সর্বত্র। নিরাপত্তা রক্ষায় যেসব সৈন্য রয়েছে, তারা উৎসুক সৈন্যদের মোকাবেলা করতে একবারে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। ঘেমে-নেয়ে উঠেছে তাদের সুঠাম শরীর।

সৈন্যরা সবাই জানে, তাজ খান আর দরিয়া খানের সাথে সুলতান সোলায়মান খানের একটা বড়ো ধরনের যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে। শূর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন সোলায়মান খান। তিনি শূরদের বঙ্গ ছাড়া করবার প্রতিজ্ঞা করেছেন। আর এই বিদ্রোহের খবর কানে যাওয়া মাত্র তাঁকে দমন করতে হাজির হয়ে গেছেন এই দুই শূর সেনাপতি। ইতোমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় দু'পক্ষের খণ্ডযুদ্ধও শুরু হয়ে গেছে। অবশ্য এগুলো মূল যুদ্ধের আগে মহড়ার মতো ব্যাপার, তাই কেউ এতদিন তেমন গা করেনি। তবে আজ হঠাৎ তাজ খানের দূত আসার খবরে সবাই বেশ নড়েচড়ে বসেছে। সবাই পূর্বাভিজ্ঞতা থেকে অনুমান-অনুধাবন করতে পারছে, দূত সম্ভবত মূল যুদ্ধের ইশতেহার নিয়েই এসেছে।

সৈন্যদের ভেতর গুঞ্জনের মূল বিষয়বস্তুও মূলত দূত এবং এই যুদ্ধের বার্তা। সৈন্যদের গুঞ্জনকে মাত্রা ছাড়াতে দেখে 'কাহার' তার ঢোলে বাড়ি দিয়ে তাদের থামতে সংকেত দিল। তাতে অবশ্য তেমন ফল হল না, বরং আর এক দফা বেড়ে গেল কানাকানি। সামনের কাতারের মানুষের ফাঁকফোকর দিয়ে দূতকে দেখবার চেষ্টা করতে করতে উচ্চস্বরে আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগল।

সামান্য ক'জন সৈন্যই ভাগ্যবান বলে প্রতীয়মান হল। নিরাপত্তা রক্ষীদের শরীরের ফাঁকফোকর গলে কেবল তারাই দেখতে পেল দূতকে। বিপক্ষ দলের সেনাপতি তাজ খানের পাঠানো দূত লাল নিয়ন্ত্রক তাঁবুর ঠিক সামনে হাঁটু ভেঙে বসে আছে। সে অবশ্য মোটেও তাঁর নিজের ইচ্ছেতে বসে নেই। নিরাপত্তার খাতিরে সোলায়মান খানের দু'জন বিশ্বস্ত কর্চি (দেহরক্ষী) তাকে পেছন থেকে হাত মুচড়ে এবং শক্ত করে চেপে ধরে বসতে বাধ্য করেছে। দূত যাতে কোনো রকমের অতর্কিত হামলার সুযোগ না পায়, সেজন্যই এমন ব্যবস্থা। যদিও তাকে বসানোর আগেই সোলায়মান খানের সৈন্যরা তার শরীর তল্লাশি করে দেখে নিয়েছে। ভালোভাবে নিশ্চিতও করেছে যে, দূতের কাছে কোনো ধরনের গুপ্ত-অস্ত্র নেই। তবুও সতর্কতার মার নেই। কারণ যুদ্ধকালীন অবস্থায় সামান্যতম বেখেয়ালের ভুলও বিশাল ক্ষতির কারণ হয়ে বসতে পারে।

একজন কর্চি বাইরের নিরাপত্তায় সন্তুষ্ট হয়ে সুলতানের তাঁবুতে ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ পর শাহি নিয়ন্ত্রক তাঁবুর আচ্ছাদন সরিয়ে বাইরে

বেরিয়ে এল আরও চারজন কর্চি। তারা আর এক দফা সব দেখেশুনে নিশ্চিত হয়ে নিয়ে একটা অদ্ভুত হুংকার ছাড়ল। এই হুংকার সুলতানের আগমনের আগাম সংকেত বলে বিবেচিত হয়।

কর্চিদের হুংকার শুনে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন সুলতান সোলায়মান খান স্বয়ং। সুলতানের দর্শন পাওয়া মাত্র সমস্ত গুঞ্জন যেন কর্পূরের মতো বাতাসে মিলিয়ে গেল। নেমে এল পিনপতন নিস্তব্ধতা। সুলতানকে দেখতে পেয়ে সবাই যেন তাদের হৃৎস্পন্দনও আটকে ফেলেছে, মূহূর্তের জন্য ভুলে গেছে নিশ্বাস নিতেও।

লম্বা, পেশিবহুল এবং বলিষ্ঠ মানুষ সুলতান সোলায়মান খান। বয়সের সাথে মুখ জুড়ে কাঁচাপাকা মানানসই দাড়ি, শুধু গোঁফটাকে মুসলিম রীতি অনুসারে নিখুঁতভাবে চেঁছে ফেলা হয়েছে। গায়ে যুদ্ধকালীন ভারী বর্মের বদলে চামড়ার কারুকার্য করা পাতলা বাদামি রঙের বর্ম। বয়সের কারণে অবাধ্য হয়ে থাকা ভুঁড়ির জন্য সেটা একটু উঁচু হয়ে আছে বটে, তবে তাতে মোটেও তাঁর সৌন্দর্যহানি ঘটেনি। বর্মের নিচে তিনি সোনালি সুতোর কাজ করা সাদা একটা কুর্তা পরে আছেন। তাঁর শরীরে অলংকার বা আভূষণ বলতে শুধু হাত ভরা আংটি। যার প্রতিটাতেই দামি সব পাথর বসানো। সেই অর্থে আজ অন্যদিনের চেয়ে সাদামাটা পোশাক-আশাক তাঁর।

তাঁবুর বাইরে বের হওয়া মাত্র সুলতানের মনে হল তিনি বুঝি হঠাৎ করে দোজখে চলে এসেছেন। গ্রীষ্মের এক পশলা গরম হাওয়ার হলকা বয়ে গেল তার শরীরের ওপর দিয়ে। এক মুহূর্তের জন্য বোধ হল হাওয়া নয়, বরং একটা আগুনের ঝাপটা বয়ে গেল। তিনি নীরবে বাঙ্গাল মুলুকের অবাধ্য মধ্য-দুপুরের তেজ সয়ে নিলেন কিছুক্ষণ। তারপর এগিয়ে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন তাঁবুর বাইরের দিকে, কোমরবন্ধনীতে দু'হাতের বুড়ো আঙুল গুঁজে।

এই দাঁড়ানো আসলে তাঁর সেনাপতিদের অপেক্ষায়। সুলতানকে তাঁদের জন্য অপেক্ষারত দেখে তিনজন সেনাপ্রধানও দ্রুত পায়ে তাঁর পেছনে এসে পৌঁছালেন। তিনজনই শক্তপোক্ত মানুষ। শরীরে ভারী রুপালি ধাতব বর্ম, আর কোমরে বাঁকানো তলোয়ার ঝুলছে। এই ধরনের তলোয়ারকে বলে 'শমশের'। এই তলোয়ারের উৎপত্তি পারস্যদেশে।

সুলতান সোলায়মান খানের তিনজন সেনাপ্রধানের ভেতর সবচেয়ে বয়স্ক যিনি, তাঁর নাম ইব্রাহিম খান। তাঁর নিখুঁত কামানো মুখে বয়সের বলিরেখার ছাপ স্পষ্ট। তবে তাঁর পেটানো পেশিবহুল শরীর দেখলে

যুবক বলেই ভ্রম হয়। শুধু চুলটাই যা একটু বিভ্রাট করে ফেলেছে। ইব্রাহিম খানের মাথার চুল পর্বতের চুড়োয় জমে থাকা তুষারের কথা মনে করিয়ে দেয়। এ-অঞ্চলের মানুষ তাঁর সফেদ চুলের জন্যই সম্ভবত আড়ালে-আবডালে তাঁকে 'বুড়ো বাঘ' বলে ডাকে।

ইব্রাহিম খানের ঠিক ডান পাশে যে সেনাপ্রধান এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর নাম বায়োজিদ খান। মাঝবয়েসি তরুণ। ভারী শরীর, চওড়া কাঁধ আর বিশাল পেশিবহুল দুটি হাত। চেহারা ইব্রাহিম খানের ঠিক উলটো, নিখুঁত কামানো মাথার সাথে গোলাকার মুখভর্তি কালো চাপদাড়ি। মাথায় একগাছি চুল না থাকলেও তাঁকে অত্যন্ত সুদর্শন একজন মানুষ হিসেবেই গণ্য করা যায়। তবে শুধু সুদর্শন বললে মস্ত ভুল হবে, কারণ এই তল্লাটে বায়োজিদ খানের মতো শক্তিশালী মানুষ পাওয়াও দুষ্কর। অনেকে বলে তিনি নাকি দু-আঙুলে চাপ দিয়ে আস্ত মোহর ভেঙে ফেলতে পারেন।

সোলায়মান খানের তৃতীয় এবং সর্বশেষ সেনাপতির নাম আবু জাফর। আপাতদৃষ্টিতে শীর্ণ একজন মানুষ, কিন্তু সমস্ত শরীরটা আদতে মেদহীন ছিপছিপে পাকানো পেশিতে ভরপুর। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। কপাল বেয়ে নেমে আসা লম্বা চুলের ভেতর চোখ দুটো ঢাকা পড়ে থাকে। কখনও যদি ভুলেও চোখদুটো কারও নজরে পড়ে যায়, তবে তার সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কেন জানি কোনো ধূর্ত শেয়ালের কথা মনে করিয়ে দেয়। অত্যন্ত কুশলী একজন মানুষ এই আবু জাফর। রণকৌশলে তাকে হারাবার মতো লোক এ-তল্লাটে খুব কমই আছে।

সেনাপ্রধান তিনজন সন্তর্পণে সুলতানের পেছনে এসে পৌঁছালেও, সোলায়মান খান তাদের উপস্থিতি টের পেলেন ঠিকই। সেনাপতিদের নিকটবর্তিতা টের পেয়ে তিনি লম্বা লম্বা কদম ফেলে এগিয়ে গেলেন দূতের ঠিক সামনে।

দূত চোখের সামনে সোলায়মান খানের শাহি জুতাজোড়া দেখে মুখ তুলে চাইল। এই সুযোগে সোলায়মান খানও ভালো করে দূতের পোড়খাওয়া চেহারাটা দেখে নিলেন। চিরুনি অভিযানের মতো নজর হানলেন শরীরের সর্বত্র। অভিজ্ঞ চোখে পড়ে ফেললেন অনেক কিছু। বৃদ্ধাঙ্গুলির ওপরে তির ছোড়ার কালো দাগ। তলোয়ার ধরার কারণে হাতের গিঁটজুড়ে পড়া কড়া। ছিপছিপে শরীর জুড়ে জীবন্ত প্রাণীর মতন কিলবিলে পাকানো পেশি। সবমিলিয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলেন লোকটা একজন পোড়খাওয়া সৈনিক। তার চোখের নিচে রাত জাগার চিহ্ন স্পষ্ট। সুরমা দেওয়া চোখের মতন ভারী কালচে ছাপ সেখানে। চেহারা বিশ্লেষণ

শেষ করে সোলায়মান খান তার চিরাচরিত দরাজ কণ্ঠে দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার প্রভু তাজ খান কী সংবাদ প্রেরণ করেছেন, শুনি?"

দূত পূর্ণদৃষ্টি মেলে সোলায়মান খানের দিকে চেয়ে নির্ভীকভাবে বলল, "আমার প্রভু যে তাম্বূলখানা (পত্র) পাঠিয়েছেন তাতেই সব লেখা আছে। আমাকে আলাদা করে নতুন কিছু বলতে তিনি নির্দেশ দেননি। আমাকে শুধু আপনার প্রত্যুত্তর নিয়ে ফিরে যেতে বলা হয়েছে।"

দূতের কথা শুনে সেনাপতি বায়োজিদ খান তাম্বূলটি নিয়ে আসতে ইশারা করলেন। একজন সাধারণ সৈনিক এগিয়ে এল। তল্লাশির সময় কেড়ে নেওয়া তাম্বূলটি এতক্ষণ তার হাতের শোভা বর্ধন করছিল। সৈনিকটি এসেই বায়োজিদ খানের সামনে বসে পড়ল, হাঁটু ভেঙে। মাটিতে। নিজের মাথাটা নিচু করে সসম্মানে দু'হাতে উঁচিয়ে ধরল তাম্বূলখানা। সম্ভ্রমের সাথে বায়োজিদ খানের দিকে বাড়িয়ে ধরল যথাসম্ভব। সেনাপ্রধান বায়োজিদ খান তাম্বূল হাতে নেওয়া মাত্র, সোলায়মান খান ইশারায় সেটাকে পড়ে শোনাবার নির্দেশ দিলেন তাঁকে।

দ্রুত হাতে তাম্বূলটির লাল গালা করা মোহর ভেঙে ফেললেন বায়োজিদ খান। তারপর সুতোর প্যাঁচ ছাড়িয়ে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরলেন ফারসিতে লেখা পত্রটা। উচ্চস্বরে আওড়াতে শুরু করলেন—

আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু সোলায়মান খান,

আমি জানি তুমি বঙ্গের মসনদকে তোমার প্রিয় স্ত্রীর আব্বাজানের দেওয়া যৌতুক মনে করে বসে আছ। কিন্তু এই সম্পত্তির যোগ্য দাবিদার তুমি নও। বরং এর দাবিদার আমার প্রভু, দিল্লির শাহেনশাহ ফরিদুদ্দিন মজফফর শের শাহ শূরি এবং তার বংশধররা। তুমি যদি তোমার অন্তরে এই বিশ্বাসের দ্বিমত লালন করে থাক তবে এর ফলাফল হবে ভয়ংকর। আমি তোমার হৃদ্‌পিণ্ডের ভেতর আমার শমশের (পারস্যের বিশেষ ধরনের বাঁকানো তরবারি) দিয়ে এই কথা চিরস্থায়ী করে লিখে দেব, যাতে তুমি দ্বিতীয়বার একই ভুল করবার আর কোনো সুযোগ না পাও। বিগত সকল বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ যেমন কোনো ফল দেয়নি, তেমনই তোমার এবারের বিদ্রোহও না-কামিয়াব হবে ইনশাহআল্লাহ্! মনে রেখো এই ভুঁইফোঁড় বিদ্রোহ তোমাকে মৃত্যু ভিন্ন দ্বিতীয় কোনো ফল দেবে না। তবে তুমি যদি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে নিজের হাঁটুতে বসে প্রাণভিক্ষা চাও, তোমার হাতে বন্দি আমাদের সৈন্যাদের এখনই মুক্ত করে দাও, তবে আমি আমার প্রভু দিল্লির সুলতান ফরিদুদ্দিন মুজাফফর শের খান

তৃতীয় কিস্তি

পারস্যের শেকল

১৮

একঘেয়ে খটখট আওয়াজ শুনে ইসমাইলের তন্দ্রা টুটে গেল। নিদ্রার আবেশটুকু কেটে যাওয়া মাত্র তার নজর গেল পাশে শুয়ে থাকা ছোটোভাইয়ের দিকে। ভোরের আলোয় ঈসার নিশ্চিন্ত নির্ভার ঘুম দেখে স্বস্তি পেল সে। চোখ ডলে নিয়ে আশেপাশে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল তারা এখন কোথায়। ভোরের আবছা আলোয় চলতি সড়কটা দেখেই চিনতে পারল সে। কাফেলা এখনও ‘সড়ক-ই-আজম’ ধরেই এগিয়ে চলেছে। আগের মতন সেই নুড়ি বিছানো পথ, দু’ধারে গাছের সারি। ভোরের আলোতে যতটুকু দেখা যায়, তাতেই বোঝা যাচ্ছে গাছের সারি ক্রমান্বয়ে হালকা হয়ে আসছে।

বিগত মাস চারেক ধরে তারা এই রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। এতদিন ধরে ক্রমাগত একই রাস্তায় চললে রাস্তার কাঠামো এমনিতেই চেনা হয়ে যায়। ইসমাইল বহু আগেই শুনেছিল শূর সম্রাট শের খান এই বিশাল অজগরের মতন সর্পিল রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেননি। তাঁর ছেলে ইসলাম শাহ মাত্র ক’দিন আগে এই মহাসড়কের সম্পূর্ণ কাজ শেষ করে সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। লোকে বলে, এই রাস্তা নাকি সরাসরি বঙ্গ থেকে কাবুল পর্যন্ত চলে গেছে। এত বড়ো সড়ক এর আগে কেউ বানানোর দুঃসাহস করেনি, কল্পনাতেও না। শের খান লোকটার কলিজা ছিল তা স্বীকার করতেই হয়।

পুবদিকে আলো করে সকালের মিষ্টি রোদ এসে পড়ল ইসমাইলের গায়ে। আজ প্রভাতের আলো ফোটার আগেই কাফেলা যাত্রা শুরু করে দিয়েছে। এই কাফেলার লোকজন যত দ্রুত সম্ভব পারস্যে পৌঁছাতে ব্যস্ত। মাতৃভূমির টান সবারই প্রবল। তার চেয়েও প্রবল প্রিয়জনদের কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। আসলে প্রিয়জন না থাকলে কোনো ভূমিই আপন হয় না। সেটা মাতৃভূমি হলেও।

ঝুপ করে ইসমাইলের নিজের প্রিয়জনদের কথা মনে পড়ল। নিজের অজান্তে চোখের কোণে বাষ্প জমে যাচ্ছে অনুধাবন করে সে একপ্রকার জোর করেই ভাবনাটুকু মাথা থেকে তিরোহিত করল। সামনে তাকাল চিন্তাক্লিষ্ট মনটাকে স্মৃতির উঠান থেকে পুরোপুরি সরিয়ে নিতে। তাদের গাড়িটাকে আগের মতই বিশাল শিংওয়ালা চারটা হিন্দুস্থানি বলদ টেনে নিয়ে চলেছে। সবগুলোর গায়ের রং পোড়ামাটির মতন লাল। হিন্দুস্থানি বলদের শিং এমন বিশাল কেন হয়, কে জানে!

ইসমাইলদের সামনেই একই রকম আরও কয়েকটা গোরুর গাড়ি চলেছে। সবগুলোই তাদের মতোই ক্রীতদাস পাচারের গাড়ি। প্রত্যেকটা গাড়ির ওপরে লোহা এবং কাঠ দিয়ে মজবুত খাঁচা বানানো হয়েছে। সেইসব খাঁচার ভেতর তাদের মতন অল্পবয়স্ক বাচ্চাদের ঠেলে-ঠেসে সেঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে, এদের সবার বয়সই তেরো বছরের নিচে। সামনের প্রথম তিন গাড়ির পিঞ্জরে রাখা হয়েছে শুধুমাত্র কিশোরী মেয়েদের। পারস্যে দাসী হিসেবে হিন্দুস্থানি মেয়েদের কদর বেশ ভালো। বয়স তেরোর নিচে হলে দামটাও আকাশচুম্বী হয়। মেয়েদের শরীরে যেন যাত্রার প্রভাব না পড়ে সেজন্য তাদের পিঁজরায় খুব কম সংখ্যক মেয়েকেই রাখা হয়েছে। কিশোরীদের শরীর সামান্য ভেঙে গেলেই এক পয়সা দামও মিলবে না। কানাকড়িতেও বিকোবে না মালগুলো।

এদিকে পেছনের খাঁচাগুলোর দশা সামনের তিনটে খাঁচার ঠিক উলটো। ইসমাইল জানে তাদের এই ছোট্ট খাঁচার ভেতরেই প্রায় বারোজন বাচ্চাকে চেপেচুপে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়ছে। নড়ার জায়গাটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। তবু এই ঠেসাঠেসির ভেতরেই ক্লান্ত শ্রান্ত বাচ্চারা বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। ইসমাইল বুকের শ্বাস মোচন করে। মানুষ আসলেই অভ্যাসের দাস। তবু এখন কিছুটা ভালো, কিছুদিন আগেও এই সংখ্যাটা ছিল পনেরোর ঘরে। দু’জন কাফেলার এই বিশাল পথ পাড়ি দেবার ধকল সহ্য করতে পারেনি। মাত্র সাত দিনের মাথায় ভবলীলা সাঙ্গ করেছে। অন্যজন পালাতে গিয়ে দাস ব্যবসায়ীদের হাতে ধরা পড়েছিল। পালানোর শাস্তি কী সেটা জানাতে সবার সামনে ব্যবসায়ীরা তাকে নির্দয়ভাবে চাবুকপেটা করেছে। অতটুকুন শরীর চাবুকের আঘাত সইতে পারেনি। পারার কথাও ছিল না। সে রাতেই তার গা কাঁপিয়ে প্রবল জ্বর ওঠে এবং সেই জ্বরের ঘোরেই ইহজগতের মায়া ত্যাগ করে বেঁচে যায় বেচারা। মারা যাওয়ার পরেও তাকে মায়া দেখায়নি ব্যবসায়ীরা। শরীর থেকে কাপড় খুলে নিয়ে সেটাকে উলটো করে খাঁচার সামনে ঝুলিয়ে রেখেছিল পুরো

একদিন। যাতে নগ্ন, রুগ্ণ এবং নিস্তেজ শরীরটা দেখে অন্যরা শিক্ষা নিয়ে নেয়, পালানোর চিন্তাটুকু মাথা থেকে চিরতরে ঝেড়েমুছে দূরীভূত করে। এ-ও প্রায় দু'মাস আগের ঘটনা। এখন বাচ্চারা সবাই তাদের নিজ নিজ ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে। কেউ আর পালানোর ভাবনাটুকুও ভাবে না। ইসমাইল নিজেও আর পালানোর চিন্তা করে না।

সে ঘুমন্ত ভাইয়ের দিকে চেয়ে তার মাথার লম্বা চুলে হাত বুলিয়ে দিল পরম মমতায়। পারস্যে তাদের ভাগ্যে কী আছে, কে জানে!

ইসমাইল মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেবে কি না তা বুঝল না। সেদিন রাতে মারা যাওয়ার কথা ছিল তাদের। মৃত্যুর হাতছানিকে উপেক্ষা করে বেঁচে যে আছে এটাই তো অনেক। আব্বাজান মারা যাওয়ার পর কেল্লার মানুষ চরম আক্রোশে হামলা করেছিল তাদের আশ্রয়ে। কুতুবউদ্দিন চাচাজান নিরাপত্তার জন্য যাদের রেখেছিলেন তাদের দু'জন মারা গিয়েছিল হামলার প্রথম ধাক্কাতেই। বাকিরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বেঁচেছিল কোনোমতে। ওদের অবশ্য দোষ দিয়ে লাভ নেই, হাজারখানেক মানুষের সামনে ওরা খড়কুটো হয়ে হয়ে উড়ে যেত এমনিতেই। পালিয়ে বরং প্রাণে অন্তত বেঁচেছে বেচারারা।

আম্মিজানের কী হল জানার সুযোগ হয়নি। বোন সাউন্নেসা বেঁচে আছে কিনা, তার পরিণতি কী হয়েছে তা-ও জানতে পারেনি। ইসমাইল মনে মনে দু'জনেরই মৃত্যু কামনা করল। যুদ্ধে পরাজিত নারীদের ভাগ্যে কী ঘটে সেটা সে জানে। এখন তাকে পূর্ণবয়স্কদের কাতারেই ফেলা যায়। তারা দু'ভাই বেঁচে গেছে খুবই কাকতালীয়ভাবে। ইসমাইল যেন এক পলকের জন্য চোখের সামনেই সমস্ত ঘটনাটা দেখতে পেল। কিন্তু ভাবনার মাঝখানে আবার সেই একঘেয়ে খটখট আওয়াজ কেটে দিল ভাবনার তাল। এতদিন গোরুর গাড়ির চাকার ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেও এই নতুন খটখট আওয়াজটা বড়ো কর্কশ। বিশ্রী।

বিরক্ত হয়ে খটখট আওয়াজটার উৎস সন্ধানে ঘাড় ফেরাল ইসমাইল খান। এতটুকুতেই দু'জন ছেলের গায়ে ধাক্কা লেগে গেল। ঘুমের ঘোরেই ককিয়ে উঠল তারা। খাঁচার বাইরের এক কোণে একগাদা কাঠের তালিসমান (তাবিজ) ঝুলতে দেখতে পেল। গতকাল রাতেও এগুলো ওখানে ছিল না। অন্তত কাল ঘুমানোর আগে সে এগুলোকে যে দেখেনি এ-ব্যাপারে নিশ্চিত। সম্ভবত কাফেলার প্রধান আজ যাত্রার প্রারম্ভে এগুলো ঝুলিয়ে দিয়েছে। ঘুমে বেঘোর থাকার কারণে হয়তো জানতেও পারেনি। এই কাঠের তালিসমানগুলোই এখন উঁচু-নিচু অসমতল রাস্তার জন্য

লোহার গরাদে বাড়ি খেয়ে খটাখট বোল তুলেছে। জিন-ভূত তাড়ানোর জন্য গাড়ির সাথে তালিসমান বেঁধে রাখা পারস্যের ব্যবসায়ীদের অতিপ্রাচীন রীতি। এতদিন প্রধান ব্যবসায়ী কাপড়ের তালিসমান সেঁটে রেখেছিল। আজ ব্যাটা পারসিক কোথা থেকে একগাদা কাঠের তালিসমান এনে সেগুলোকেও ঝুলিয়ে দিয়েছে। কাফেলা প্রধানের জিন-ভূতের ভয় প্রবল। প্রায়ই তাকে আকিক পাথরের তসবি হাতে দোয়া-দরুদ পড়তে দেখা যায়। আল্লা মালুম এই ভয়ের কারণ কী। পেছনে কোনো ইতিহাস আছে অবশ্যই।

পারসিক ব্যবসায়ী লোকটা অবশ্য খুব খারাপ না। ব্যাটা ভয়ানক নির্দয় এ ব্যাপারে কারও সন্দেহ নেই, তবে এখন পর্যন্ত বিনা কারণে সে কারও ওপর অত্যাচার করেনি। বলা বাহুল্য তার ব্যবহার ভীষণরকম বাজে। নিজের লোকদের সাথেই সারাক্ষণ তুই-তোকারি করে। পান থেকে চুন খসলেই বাপ-মা তুলে গালি দিয়ে বসে। সবাইকে নিজের পদানত দেখতেই সে পছন্দ করে বেশি, খুশিও হয়। অবশ্য তাকে দোষ দিয়েও লাভ নেই। কাফেলার অন্য লোকগুলো মহা ফাঁকিবাজ। ব্যবসায়ী নজর সরালেই এরা কাজের গুষ্টি উদ্ধার করে ছাড়ে। কাফেলার প্রধানের নাম আরদেশির জামশেদি। অন্যদের কথাবার্তা শুনে ইসমাইল এতদিনে সেটা আবিষ্কার করে ফেলেছে। ইসমাইল যে ফারসি জানে এটা ব্যবসায়ীরা এখনও জানে না। ইসমাইল, ঈসাকেও নিষেধ করে দিয়েছে তারা যে ফারসি জানে তা যেন ঘুণাক্ষরেও কাউকে না বলে। তারা নিজেদের ভেতর কথা বলার জন্য বাংলাকে বেছে নিয়েছে। বঙ্গের ভাষা জানা লোক এখানে বাচ্চাগুলো ছাড়া আর একজনও নেই। ইসমাইল কাফেলার সবার ভাষা বুঝতে পারলেও, অন্যরা তাদের ভাষা বিন্দুমাত্র বুঝতে পারে না।

হঠাৎ অশ্বখুরের শব্দ পেয়ে ইসমাইল দ্রুত চোখ মুদে মটকা মেরে পড়ে রইল। চোখটাকে ঈষৎ ফাঁক করে দেখার চেষ্টা করল ঘোড়সওয়ারকে। দেখতে পেল, লোকটা এদিকেই এগিয়ে এসেছে। তার হাতে একটা চিকন লম্বা বেত। কাছে আসতেই চিনতে পারল ইসমাইল, যে লোকটা এগিয়ে আসছে তার নাম পাইসদা। কাফেলার নিরাপত্তার দায়িত্ব এর হাতেই ন্যস্ত। কাফেলার রক্ষীদের প্রধান সে। এই লোকটা মহা বদ এবং ধুরন্ধর। কারণে-অকারণে যাকে তাকে বেতের বাড়ি বসিয়ে দেয়। এখন ইসমাইলকে জেগে থাকতে দেখলেই অকারণে বেতের বাড়ি বসাবে বদ লোকটা। বেতের বাড়ি থেকে বাঁচতে ঘুমের ভান ধরে পড়ে রইল। চোখদুটো আলতো খুলে বোঝার চেষ্টা করল লোকটার গতিবিধি।

পাইসদা ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিয়ে তাদের গাড়ির তালে ছোটাতে ছোটাতে

খাঁচার ভেতরের বাচ্চাদের গুনতে শুরু করল। এই খাঁচার গণনা শেষ করে এগিয়ে গেল সামনের খাঁচাটার দিকে। লোকটা চলে গেলে ইসমাইল খেয়াল করল আজ তাদের গাড়িটার অবস্থান হয়েছে কাফেলার একদম শেষ মাথায়। ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে চলেছে প্রকাণ্ড শকটটা।

বেশ খানিকক্ষণ চলার পর একটা জলাশয় দেখে কাফেলাকে থামতে নির্দেশ দেওয়া হল। সারাদিনে তিনবার বাচ্চাদের খাঁচার বাইরে বের করা হয়, এখন প্রথমবার। কাফেলা থামার সাথে সাথে অনেকগুলো দাস এসে ঝটপট খাঁচাগুলোর দোর খুলে দিল। যেসব বাচ্চারা জেগে গেছিল তারা হুড়মুড় করে নেমে এলো শকটের জিন্দান (কারাগার) থেকে। যারা ঘুমিয়ে ছিল তাদের কপালে জুটল বেত অথবা চাবুকের হালকা আদর। প্রতিদিনের এ আদরটুকু বেশ কাজ দেয়। সমস্ত বাচ্চারা সুড়সুড় করে খাঁচার বাইরে বের হয়ে এক সারিতে দাঁড়িয়ে যায়।

ইসমাইল আশেপাশের এলাকাটায় নজর বুলাল। এই নতুন জায়গাটার ভূমি বেশ পাহাড়ি এবং পাথুরে। বেশ বড়ো ধরনের কিছু টিলা এবং পাহাড় থাকে থাকে নেমে এসেছে একদম তাদের পায়ের নিচ পর্যন্ত। পাহাড়ের পাদদেশেই একটা ছোট্ট জলাশয়। জলাশয়ের জল একদম টলটলে, স্ফটিকসদৃশ স্বচ্ছ। জলাশয়ের চারপাশে ফণীমনসা (ক্যাকটাস) জাতীয় ঝোপ বেড়ে উঠেছে ইতস্তত। আর এক দফা গণনা শেষে প্রতিদিনের মতো তাদেরকে প্রত্যুষের কাজ সেরে নিতে মুক্ত করে দেওয়া হল। পিঠে চাবুকের বাড়ি পড়তেই সচেতন হয়ে উঠল সবাই। দ্রুততার সাথে যে যার মতো ঝোপের আড়ালে চলে গেল। ব্যবসায়ীর দাসগুলো চাবুক হাতে এমনভাবে দাঁড়িয়ে রইল যাতে কারও পালানোর সুযোগ না থাকে। সকালের এই ব্যাপারটা ইসমাইলের কাছে খুবই জঘন্য লাগে, একই সাথে লজ্জারও। খানদানি অভ্যাসের কারণে হয়তো। কিন্তু এখন আর কোনো উপায় নেই। এখন সে আর ঈসা কোনো সুলতান বা দেওয়ানের পুত্র নয়, বরং নাম-পরিচয়হীন সামান্য দাস। আর দাসদের লজ্জা থাকতে নেই। এখানে লজ্জার মূল্য দেওয়া হয় চাবুকের বাড়িতে। তাও গুনে গুনে।

সকালের বিশেষ কাজকর্মের সমাপ্তিতে সবাইকে আর এক দফা কাফেলার সামনে ফিরতে হল। তাদেরকে আগের মতোই একই সারিতে দাঁড় করিয়ে সারা হল আর এক দফা গণনা পর্ব। এতবার গণনার উদ্দেশ্য একটাই, যাতে একটি বাচ্চাও দলছুট হয়ে পালিয়ে যেতে না পারে। গণনা শেষে খাবার সরবরাহ করা হল সবাইকে। খাদ্যবস্তু তেমন আহামরি কিছু না। একটা যবের রুটি আর এক চামচ সুরুয়া। দাসদের জন্য এটাই সর্বোচ্চ খাবার। ঈসা প্রথম প্রথম খেতে চাইত না, কিন্তু তাকে বুঝিয়ে